দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 OCT 1991
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষার নামে প্রহসন

ডঃ আজিজুর রহমান

শিক্ষার কোন শেষ নেই। তাই জগত বিখ্যাত বিজ্ঞানী নিউটন নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমি জ্ঞান সাগরের তীরে বসে বালি নিয়ে খেলা করছি'। পবিত্র কুরআন মজিদ শৈশব থেকে কবরে যাবার আগ পর্যন্ত বিদ্যা শিক্ষার প্রতি তাগিদ দিয়েছে। তাই বোধ হয় পৃথিবীর ছোট – বড় এবং উন্নত অনুন্নত প্রতিটি দেশ এগিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। ব্যতিক্রম শুধু বাংলাদেশ। শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছনে হাঁটছে। এমন দেশ আমার জানা মতে বাংলাদেশ ছাড়া দ্বিতীয়টি আর নেই। ১৯৭১ – এর স্বাধীনতার পরে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধস নামে। শিক্ষার গুণগত মান এবং সংখ্যাগত প্রবৃদ্ধি উভয় ক্ষেত্রেই দেশটি পিছনের দিকে চলছে। অর্থাৎ একদিকে অশিক্ষিত জনসংখ্যা বাড়ছে অন্যদিকে শিক্ষার গুণগত মানের ক্রমাবনতি হচ্ছে। ১৯৭১ সালের পূর্বে বাংলাদেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে বের হয়ে আসা একজন যুবক বর্তমান সার্কভুক্ত যে কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকের চেয়ে বেশী অথবা ন্যূনতম সমান মর্যাদা পেত আন্তর্জাতিক বাজারে। কিন্তু বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এমনকি নেপাল ও ভুটানের মত দেশও বাংলাদেশে শিক্ষিত যুবকদের তাদের দেশের সমান মর্যাদা দিতে চায় না। কারণ তারা বাংলাদেশের অবনতিশীল শিক্ষার মান সম্পর্কে সচেতন। পাকিস্তান ও ভারতের শিক্ষাগত মানের উৎকর্ষ আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে টেনে আনছে শিক্ষার জন্য। বিদেশী ছাত্র – ছাত্রীদের দ্বারা ব্যয়িত অর্থ ভারত – পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবে দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ হতে হাজার হাজার ছাত্র – ছাত্রী স্বদেশের পর্যুদস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে ভারতে নিজ খরচে পড়ার জন্য পাড়ি দিচ্ছে। অধিক আর্থিক সংগতিপূর্ণ পরিবারের ছেলে-মেয়েরা পাড়ি দিচ্ছে ইউরোপ – আমেরিকা।

বাংলাদেশের শিক্ষার মানের ক্রমাবনতিশীল ধারায় সাক্ষর বহন করছে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাদান ব্যবস্থা। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষক আছে এবং বই আছে। কিন্তু শিক্ষার পরিবেশ নেই, আছে ছাত্র – শিক্ষকদের ব্যাপক রাজনীতি চর্চা। তাই বিদায় নিয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা। বিদ্যানুশীলনের স্থান দখল করেছে রণবিদ্যা শিক্ষা।

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা দিতে পারে এমন শিক্ষক নেই, বই নেই, ল্যাবরেটরী নেই, পরিবেশ নেই, আছে শুধু ছাত্র-ছাত্রী। কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন, কেন – অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজেই তো বহু সংখ্যক শিক্ষক আছেন? আমি অবশ্য শিক্ষকের সংখ্যার উপর বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি না। আমি গুরুত্ব দিচ্ছি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানে যোগ্যতার উপর। এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষাদানে নিয়োজিত আছেন তাদের যোগ্যতার মানদণ্ড সম্পর্কে একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। যে সব কলেজগুলোকে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হিসেবে মর্যাদা প্রদান করে স্নাতকোত্তর অর্থাৎ বি, এ (সম্মান) এবং এম, এ পর্যায়ের শিক্ষাদানের সুযোগ দেয়া হয়েছে।

সেগুলো দেশের সেরা সরকারী কলেজ। এসব কলেজে শিক্ষক নিয়োগ করা হয় বি, সি, এস (শিক্ষা) পরীক্ষার মাধ্যমে বর্তমানে এ শিক্ষা ক্যাডারের পদোন্নতিসহ অন্যান্য সুযোগ বাকী সব ক্যাডার অপেক্ষা অনেক কম। তাই সাধারণতঃ অন্যান্য ক্যাডারে প্রতিযোগিতায় যারা টিকতে না পারেন তারাই বি, সি, এস শিক্ষা ক্যাডারে পরীক্ষা দিয়ে সরকারী কলেজে প্রভাষক হিসেবে চাকুরীতে প্রবেশ করে। এছাড়া গণহারে বেসরকারী কলেজকে সরকারীকরণের মাধ্যমে এমন বহু শিক্ষকদের বি, সি, এস শিক্ষা ক্যাডারের সদস্য করা হয়েছে যারা কোন দিনই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে এখানে ঢুকতে পারতেন না। ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং চাকুরী সরকারীকরণের মাধ্যমে আনীত সদস্যদের সংমিশ্রণে এ ক্যাডারের গুণগত মান আরও নেমে গেছে। এ দু'শ্রেণীর মধ্যে যারা প্রতিযোগিতামূলক বি, সি, এস (শিক্ষা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অধ্যাপনায় এসেছেন তারা অনেকেই মেট্রিক ও আই, এ দ্বিতীয় বিভাগ এবং বি, এ (সম্মান) ও এম, এ দ্বিতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত। এ ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাদের রয়েছে তারা আই, এ ও বি, এ পর্যায়ে পড়াতে পারেন। বি, এ, (সম্মান) এবং এম, এ পর্যায়ে পড়াবার যোগ্যতা এদের নেই। যারা চাকুরী সরকারীকরণের ফলে সরকারী কলেজের অধ্যাপক হয়েছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখিত শ্রেণীর চেয়ে নিম্নমানের। ফলে তারা একই পর্যায়ে দায়সারা-ভাবে শিক্ষাদানের যোগ্যতা রাখেন। অবশ্য উভয় শ্রেণীর মধ্যে হয়তো কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে যার সংখ্যা এতই কম যে, তা গণনার মধ্যে আনা যায় না।

এখন দেখা যাক বি, এ (সম্মান) এম, এ পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য অধ্যাপকদের ন্যূনতম শিক্ষাগতযোগ্যতা কি প্রয়োজন? একজন শিক্ষক নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতার সমপর্যায়ে ছাত্রদের তখনই কার্যকরভাবে শিক্ষাদান করতে পারবে যখন তার ডিগ্রীর মান হবে তার সহপাঠীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। অর্থাৎ একজন অধ্যাপক যখন বি, এ (সম্মান) এবং এম, এ পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হবে তখনই সে তার সমশিক্ষাগত পর্যায়ে শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জন করে। বি, এ (সম্মান) এবং এম, এ পর্যায়ের ছাত্র – ছাত্রীদের শিক্ষাদানের এটাই ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি। এ ন্যূনতম যোগ্যতার উপরে উঠতে হলে আরও উচ্চ ডিগ্রীসহ গবেষণা যোগ্যতা থাকা দরকার। বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশেই উল্লেখিত ন্যূনতম যোগ্যতাকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশেও স্বাধীনতার পূর্বে এটাই প্রচলিত ছিল।

বি, এ (সম্মান) ও এম, এ পর্যায়ের পাঠ্যসূচী শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পরিধি অতিদ্রুত পরিবর্তনশীল। কারণ পৃথিবীর